সীমান্তবর্তী অঞ্চলে এইডস সংক্রমণের ঝুঁকিতে শিক্ষার্থীরা

মানব সভ্যতাকে যে রোগগুলো হুমকির সম্মুখীন করে তুলেছে, প্রাণঘাতী এইডস তার মধ্যে অন্যতম। এটি একটি নীরব ঘাতক। এ রোগের ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। তখন যেকোনো সংক্রামক জীবাণু সহজেই এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তিকে আক্রমণ করতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে রোগীর সংখ্যা আশঙ্কাজনক হারে বাড়ছে, যা স্বাস্থ্য খাতের জন্য নতুন উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে। ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত ঘেঁষা যশোর, চুয়াডাঙ্গা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কক্সবাজারসহ বেশ কয়েকটি জেলায় সংক্রমণের হার অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশি বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য বিভাগ।

যশোর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আয়োজিত এক স্বাস্থ্য বিভাগের বৈঠকে জানা যায়, ২০২৪ সালে এ হাসপাতালে এইচআইভি আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ছিল ২৫ জন। চলতি বছরের অর্ধেক সময়েই তা দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থাৎ জানুয়ারি থেকে জুলাই পর্যন্ত মোট ৩ হাজার ৯১৭ জনের এইচআইভি পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৭ জন নতুন রোগী শনাক্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে ২৩ জন পুরুষ ও ১৪ জন নারী। এর মধ্যে ২৫ জন শিক্ষার্থী, যাদের বয়স ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এত সংখ্যক শিক্ষার্থীর আক্রান্ত হওয়া ভবিষ্যতের জন্য বড় হুমকি। একই ধরনের চিত্র দেখা যাচ্ছে কক্সবাজার ও ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়। গত জুন মাসে যশোর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালে দ্বিতীয়বার একজন এইডস রোগী সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। কোভিডের সময় এই হাসপাতালেই আরেকজন এইডস রোগী প্রথমবার সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। প্রায় পাঁচ বছর পর একই রোগে আক্রান্ত আরেকজন নারী সন্তান জন্ম দিয়েছেন। এইডস রোগীদের সরকারিভাবে চিকিৎসা ও অন্যান্য সেবা প্রদানের জন্য একটি অ্যান্টিরেট্রোভাইরাল থেরাপি (এআরটি) সেন্টার চালু রয়েছে।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের মতে, সীমান্তবর্তী এলাকায় মাদক পাচার ও সেবন, অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক এবং বিদেশফেরত কর্মীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব এ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বাংলাদেশে এখনও এইচআইভি

নিয়ে ব্যাপক কুসংস্কার রয়েছে। অনেকেই পরীক্ষা করাতে চান না, আবার আক্রান্তরাও লুকিয়ে থাকেন। ফলে চিকিৎসা পাওয়া কঠিন হয় এবং সংক্রমণও বেড়ে যায়। যশোরের এক রোগী জানান বিদেশে কর্মরত অবস্থায় ভাইরাসে আক্রান্ত হলেও দীর্ঘদিন তা বুঝতে পারেননি তিনি। দেশে ফেরার পর অসুস্থ হলে পরীক্ষা করে জানা যায়, তিনি এইচআইভি পজিটিভ। কিন্তু সামাজিক লজ্জা ও ভয়ের কারণে তিনি দীর্ঘদিন চিকিৎসা নেননি। ফলে পরিবারের আরও সদস্য সংক্রমণের শঙ্কায় পড়েছেন। এমন ঘটনা সীমান্তবর্তী জেলায় অজস্র, যা প্রকাশ্যে আসছে না শুধুমাত্র সামাজিক চাপের কারণে।

জাতিসংঘের এইডস বিষয়ক সংস্থার (ইউএনএইডস) মতে, বাংলাদেশ এখনও নিম্ন সংক্রমণ হারবিশিষ্ট দেশ হলেও সীমান্তবর্তী এলাকায় আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে। এ এলাকার তরুণরা অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়। যশোর সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশ বিরাজ করছে। ভারত থেকে মানুষের অবাধ যাতায়াত, মাদক সেবন ও পাচার, যৌনপল্লির উপস্থিতি এবং নিরাপদ যৌন আচরণের অভাব সংক্রমণ বাড়াচ্ছে। এ ভাইরাস রোগীর দেহ থেকে অন্যের শরীরে ছড়ায় রক্ত ও বীর্যের মাধ্যমে। বীর্যের মাধ্যমে সংক্রমিত হয় বলেই এই রোগকে ‘সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ’ হিসেবে গণ্য করা হয়। এ রোগের লক্ষণগুলোর মধ্যে হলো ঘন ঘন জ্বর হওয়া ও এক-দেড় মাস ধরে একটানা জ্বর। জ্বরের সঙ্গে গলায় অস্বাভাবিক ব্যথা হয়। খাবার খেতে ও গলা দিয়ে নামতে সমস্যা হয়। প্রায় ৮৮ শতাংশ রোগীর ক্ষেত্রে প্রথম তিন সপ্তাহের মধ্যেই গলায় র্যাশ দেখা দেয়। তীব্র প্রদাহ হতে শুরু করে। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে ঘাম। ঘুমের মধ্যেও তীব্র ঘাম হয়। শরীরে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমতে থাকে বলে অল্পতেই বমি ভাব ও পেটের সমস্যা দেখা যায়।

বর্তমানে দেশে প্রায় ১৪ হাজারেরও বেশি এইচআইভি আক্রান্ত রোগী রয়েছেন, যার মধ্যে শনাক্তকৃত সংখ্যা তুলনামূলক কম। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, প্রকৃত সংখ্যা এর দ্বিগুণেরও বেশি হতে পারে। এইডস এখন নির্দিষ্ট ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে তা ধীরে ধীরে সাধারণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। আক্রান্ত ব্যক্তির মাধ্যমে এই মরণব্যাধি ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ছে। অনিরাপদ যৌন সম্পর্ক সংক্রমণের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। ইনজেকশনের সুচ ব্যবহার বিশেষত মাদকসেবীদের মধ্যে ঝুঁকি বাড়াচ্ছে। অভিবাসী শ্রমিক বা বিদেশফেরত কর্মীরা সচেতনতার অভাবে পরিবারে ভাইরাস ছড়িয়ে দিচ্ছেন। সামাজিক লজ্জা ও কুসংস্কারের ভয়ে পরীক্ষা

[illegible]

[illegible] (VCT) [illegible]

[illegible]

[illegible]

কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বর্তমানে সরকারের সরবরাহকৃত এআরটি ওষুধ পর্যাপ্ত আছে এবং চিকিৎসা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি সিভিল সার্জন কার্যালয়, সমাজসেবা অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে সঙ্গে নিয়ে জনসচেতনতা বাড়ানোর মাধ্যমে সংক্রমণ প্রতিরোধে একযোগে কাজ চলছে। অনেক ক্ষেত্রেই সমাজে এইডস সংক্রমণ নিয়ে ভ্রান্ত ধারণা বিরাজ করছে। অনেকেই ভুলভাবে মনে করেন, হাত মেলানো, একই প্লেটে খাওয়া বা পাশে বসে থাকার মাধ্যমে এইচআইভি ছড়ায়—যা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এ ধরনের ভুল ধারণা কেবল রোগীদের সামাজিকভাবে আরও কোণঠাসা করে তোলে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে উঠা-বসা দোষের নয়। তাদের সঙ্গ দেওয়া যায়। এ ধরনের রোগী নিয়মিত চিকিৎসা নিয়ে স্বাভাবিকভাবে দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে পারে।

সীমান্তবর্তী জেলায় রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি পুরো দেশের জন্য সতর্ক সংকেত। এইডস প্রতিকারের ব্যবস্থা যেহেতু এখনো অজ্ঞাত, সেহেতু প্রতিরোধই হবে এইডস থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায়। মরণব্যাধি এইডস থেকে বাঁচতে হলে সাধারণ মানুষের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। শুধু অসচেতনতার কারণে আমাদের দেশে এইডসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের এখন থেকেই সচেতন করতে না পারলে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে। গণমাধ্যম, পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একযোগে কাজ করতে হবে। তাই এখনই ব্যবস্থা না নিলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ আরও বড় স্বাস্থ্যঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এইডস নির্মূলে এগিয়ে আসতে হবে। এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতাই এখন মুখ্য বিষয়। তাই এইডস প্রতিরোধে প্রয়োজন সবার সম্মিলিত প্রচেষ্টা এবং কার্যকর পদক্ষেপ।

লেখক: সহকারী তথ্য অফিসার, তথ্য অধিদপ্তর